একদিন আত্মঘাতী পাখির খোঁজে

সাগর বিশ্বাস

প্রথম যেদিন শুনেছিলাম আসামে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে প্রতিবছর দূর-দূরান্ত থেকে একটা বিশেষ সময়ে দলে দলে পাখিরা আসে এবং 'আত্মহত্যা' করে, সেদিন বিস্মিত না হয়ে পারিনি। বিশেষত কলকাতার কিছু বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও ভ্রমণকারীর মুখে এ তথ্য জানার পর সত্যি কথা বলতে কী, জায়গাটা দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে সমগ্র আসাম জুড়ে যে রাজনৈতিক ঝড় বয়ে গেল, তার মধ্যে আমার ইচ্ছেটা মুলতুবি রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। অবশেষে আসামের নির্বাচন এবং অ-গ-প সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ঝড়ের তান্ডব স্তিমিত হলে জাতিঙ্গা দর্শনের তুলে - রাখা ইচ্ছেটাকে ধুলোবালি ঝেড়ে আর একবার নামিয়ে আনলাম।

উত্তর কাছাড় পবর্তমালার মধ্যে জাতিঙ্গা একটি উপত্যাকা। এই উপত্যকার মধ্যেই ছোট্ট গ্রাম জাতিঙ্গা। নামকরণ করেছিল জেমি নাগারা। সে উনিশ শতকের কথা। তখন এখানে জেমি নাগা সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করত। সারাবছরই তখন এই অঞ্চলে বৃষ্টি হত। 'জাতিঙ্গা' শব্দের বাঙলা মানে করলে দাঁড়ায় 'জল ও বৃষ্টির চলার পথ' (Pathway of rain and water)। বিশ শতকের প্রারম্ভে জেমি নাগারা গ্রামটি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যায়। শোনা যায় ইউলাখোনবং সূচাং নামে জয়ন্তিয়া উপজাতিভূক্ত এক ব্যক্তি ১৯০৫ সালে গ্রামটি কিনে নিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করেন। এখন এই গ্রামের বাসিন্দা মূলত জয়ন্তিয়া ও খাসি উপজাতির মানুষ।

কলকাতা থেকে বোয়িং বিমানে শিলচল পৌঁছাতে লাগে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। ট্রেনে দু'দিনের রাস্তা। শিলচর থেকে সড়ক পথে জাতিঙ্গার দূরত্ব একশো কিলোমিটারের মতো। রেলপথেও যাওয়া যায়। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার সদর শহর হাফলং থেকে মাত্র আট কিলোমিটার উত্তরে জাতিঙ্গা গ্রাম। জাতিঙ্গায় রেলস্টেশনও আছে।

ভেবেছিলাম রেলপথে যাব এবং সড়কপথে ফিরব। যদিও রেলে একটু সময় বেশি লাগে, ভ্রমণের ধকলটা সইতে হয় কম। উপরন্তু ঘন বন ও পাহাড়ি রাস্তা রেলভ্রমণ বেশ উপভোগ্যও বটে। মাঝে মাঝে নাকি আবার টানেলের ভিতর দিয়ে রেলগাড়ি যায়। সে তো আরও মজার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সড়কপথেই যেতে হল। তবে বাসে নয়। জীপে।

শিলচড় থেকে উদারবন্ধ হয়ে লামডিং এর রাস্তা ধরতে হয়। বাসে ট এটাই। নিজেদের গাড়ি থাকলে মাসিমপুর হয়ে জয়নগর যাত্রাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেতর দিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এ পথে ফেরিতে করে বরাক নদী পার হতে হয়। গাড়ি ঘোড়া সবাই ফেরিতে পার হয়। ওপারে গিয়ে বড়খোলা হয়ে সেই লামডিং এর রাস্তায় পড়া যায়। এতে পনের - কুড়ি কিলোমিটারের মতো রাস্তা কম হয়। আমরা শিলচর থেকে বাস টটাই ধরলাম। উদারবন্ধ গিয়ে কালীবাড়ির সামনে জীপ দাঁড়াল। মা কাঁচাকান্তির মন্দির। এ অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত। রিকশা, বাস, লরিতে হামেশাই দেখা যায় লেখা আছে 'জয় মা কাঁচাকান্তি'। কালীর এখানে কাঞ্চনবর্ণ রূপ।

মন্দির দর্শন করে আমরা আবার যাত্রা করলাম ছোট ছোট পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা মসৃণ রাস্তা। দু পাশে সাজানে চা বাগানু - ডলু টি এস্টট। চা বাগানটি পার হয়ে গেলে বালাছড়া পর্যন্ত একটানা সমতল পথ। বালাছড়া থেকেই পাহাড়ের শু। পথে যেতে যেতে এইসব গ্রামগুলি পড়েঃ হাতিছড়া, বালাছড়া দামছড়া, কাপুরছড়া, ডিমছড়া ইত্যাদি। ছড়ার ছড়াছড়ি আর কী। বেলা একটায় শিলচর দামছড়া, কামুরছড়া, ডিমছড়া ইত্যাদি। ছড়ার ছড়াছড়ি আর কী। বেলা একটায় শিলচর ছেড়েছিলাম, বেলা তিনটে নাগাদ আমরা বানদরখাল নামে এক জায়গায় দাঁড়ালাম। এখানে একটি রেল স্টেশন আছে। সড়কের পাশে হরেন মালাকারের দোকান। চায়ে গলা ভেজানো গেল। হরেন আসামেরই বাঙালি। অথচ উদ্বাস্তু। ভাঙাতে টুকুরগ্রামে ওদের ভিটে ছিল। দেশভাগের সময় ওই টুকুরগ্রামের ওপর দিয়েই সীমানা টানা হয়। ওদের ভিটে যদিও ভারতেন্দর ভাগেই পড়ল তথাপি হরেনের বাবা বর্ডারের পাশে থাকতে পারল না। সপরিবারে চলে

এল বড়খোলায় হরেন তখন ছোট। প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। হরেন কোনওদিন ওমুখো হয়নি। ওদের সে ভিটেমাটিতে এখন বি এস এফ - এর ক্যাম্প।

সাড়ে তিনটেয় আবার আমরা গাড়িতে উঠলাম। একটা কথা এখানে লিখতেই হবে। জাতিঙ্গা উপত্যাকার মধ্যে দিয়ে আম ার ধারণা, কেউ যদি একবার যান, তবে পাখি দেখা হোক আর না হোক প্রকৃতির মনোরম রূপ তাঁর সকল দুঃখ ও ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে। গভীর বনের বুক চিরে সর্পিল পথ কখনও উঠছে পাহাড়ের গা ঘেঁসে, কখনও নেমে আসে সমতল ধ ারক্ষেতের মাঝে। কখনও রেল লাইন, কখনও পাহাড়ি নদী জাতিঙ্গা কপালকুন্ডলার মতো নিয়ে চলে পথ দেখিয়ে। কখনও সোনালি ধানের ক্ষেত কখনও মেঘবরণ পাহাড়ের চুড়ো অনমনা করে দেয় যাত্রীকে।

ঠিক পাঁচটায় আমরা পৌঁছলাম জাতিঙ্গা। গাড়ি থেকে নেমেই বোঝা গেল একটা নভেম্বর মাস। শীতের পোশাকগুলি চড়চড় করে সকলের গায়ে চড়ে বসল। পাখি দেখার জন্য সরকার এখানে তিনটি ভিউয়িং গ্যালারি নির্মাণ করেছে। তিন ন ম্বর গ্যালারিটি অবশ্য এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয় নি। আমরা সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের চুড়োয় নির্মিত এক নম্বর গ্য ালারিতে উঠলাম। সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে প্রদোষের অন্ধকার স্তুপীকৃত হয়ে উঠেছে। আলো - আঁধারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দিগন্তব্যাপী আকাশ - পাড়াড়ের সেই অনাবিল নিস্তব্ধ আলিঙ্গন শুধু অনুভব করা চলে, লিখে প্রকাশ কার যায় না। মনে পড়ছিল সেই বিখ্যাত উক্তি - 'every literary man should embrace the solitude as a bride'. পাখিরা দেখা মিলবে না জানা কথা। কারণ এত ভালো আবহাওয়ায় ওরা অ াসে না। আসার দরকার হয় না।

গ্যালারির চাবি - কাঠি থাকে স্থানীয় ফরেস্টারের কাছে। এখানে রাত্রিবাস করার বিশেষ ব্যবস্থা নেই। চার শয্যাবিশিষ্ট একটি ডরমিটরি এখন প্রস্তুতির পথে। পাখি আসার মরসুমে (আগস্ট - অকেটাবর) যখন দর্শনার্থীর সংখ্যা কিছু বাড়ে, তখন স্থানীয় বস্তিবাসীরাও ঘরে ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। বিছানাপত্র সঙ্গে থাকলে গ্যালারির ঘরগুলিও ব্যবহার করা চলে। তবে চার-পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই ট্যুরিস্ট বাংলা, জেলা কাউন্সিলের গেস্ট হাউস রয়েছে। গেস্ট হাউসে তিন শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক ঘরের ভাড়া সামান্যই। রাতটা গেস্ট হাউসে কাটিয়ে পরদিন খুব সকালেই এসে ফরেস্টকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। ওঁর সঙ্গেই আমরা গ্যালারিতে এলাম। দোতলা গ্যালারি । দুই তলায় দুটি বড় ঘর, যাকে কেন্দ্র করে তিনদিকে এই দর্শন অলিন্দ। এছাড়ও অপেক্ষাকৃত উঁচুতে দোতলার ঘর, যাকে কেন্দ্র করে তিনদিকে এই দর্শন অলিন্দ। এছাড়াও অপেক্ষাকৃত উঁচুতে দোতলার ঘর সংলগ্ন আরও দুটি বৃহৎ কক্ষ। একটিতে লাইব্রেরি এবং মিউজিয়াম। লাইব্রেরি বলতে পাখি সম্পর্কিত কিছু ইংরাজি বই। আর মিউজিয়াম হল জাতিঙ্গায় আগমনকারী বিভিন্ন প াখির স্টীল ফটোগ্রাফ। ফরেস্টার আমাদের জানালেন, 'সাধারণত আগস্ট থেকে অকটবরের মধ্যে পাখিরা আসে। অন্য সময় আবহাওয়া অনুকূল হলে কখনও সখনও দু'চারটে এসে পড়ে।' আবহাওয়া অনুকূল ছিল না, অতএব এ যাত্রা পাখি দেখার আশা বৃথা।

এই অনুকূল আবহাওয়া একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। জ্যোৎস্নাহীন গাঢ় আঁধার রাতে যদি ঝিরঝিরে বৃষ্টির সঙ্গে মাঝারি থেকে তীব্র গতিসম্পন্ন দক্ষিণ বা দক্ষিণ - পশ্চিম হাওয়া বয়, তবেই ওরা আসে। বাত্যাবিধবস্ত ওই পক্ষীকুল তীব্র আলে ার দিকে প্রচণ্ড গতি নিয়ে ছুটে আসে। গতির এই তীব্রতার জন্য অনেকেই পাষাণ - প্রাচীরে মুখ থুবড়ে পড়ে। যারা মরে না, তারাও ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম নেয়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি আবহাওয়া 'উপযুক্ত' থ াকলে পাখি আসে এ ঘটনা সত্য। দোকানের আলো দেখেও ছুটে আসে ওরা। ঘুঘু, ডাহুক, মাছরাঙা জাতীয় পাখি। বাঙা লি দোকানদার গণেশ দে বলল একদিন তার টিনের চালের ওপর প্রচণ্ড আওয়াজ পেয়ে গিয়ে দেখে ছোট দেড়শো গ্রাম ওজনের একটা পাখি মরে পড়ে আছে। প্রচণ্ড আওয়াজের কারণ সম্পর্কে গণেশেই জানাল - খুব দ্রুত গতি নিয়ে আসার জন্যই শব্দ অত বেশি। স্থানীয় লোকের ভাষায় 'ট্যা ট্যা' পাখিগুলি যখন আসে তখন আত্মরক্ষার জন্য তৈরি থাকতে হয়। কারণ আয়তনে বিশাল ওদের তীক্ষ্ণ ঠোঁট প্রায় দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা। একটা ট্যা কাছে এদের আকর্ষণ খুব। তাই আবহ াওয়া অনুকূল হলেই তারা হ্যাজাক জ্বালিয়ে লাঠি - সোটা, সড়কি, নিয়ে তৈরি থাকে। ঝটিকা - বিধবস্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পা খিগুলো যখন আলো কাছে ছুটে আসে তখন মহা উল্লাসে ওদের সায়কবিদ্ধ করা হয়। অথবা নিষ্ঠুর লাঠির আঘাতে ধর াশায়ী করা হয়।

আর গবেষকরা গ্যালারিতে তীব্র বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকেন। ঝড়-বৃষ্টিতে বিধবস্ত হয়ে সেই দিশেহারা পাখিরা কখন আলোর টানে ছুটে এসে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলবে আমাকে বাঁচাও। কিংবা গ্যালারির রেলিঙে বসে পিট পিট করে তাকিয়ে জবজবে ডানা দুটো সামান্য তোলার চেষ্টা না করেও সুধোবে, ইটস্ আ ভেরি ব্যাড ওয়েদার, ডু-ইউ ফীল? তখন কৌশলে এদের ধরে চলবে নানা গবেষণা, কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কী ওদের পরিচয় ইত্যাদি। জাতিঙ্গায় যে পাখিরা আসে তাদের একটি তালিকা (ছবি সব) গ্যালারি সংলগ্ন মিউজিয়ামে রাখা আসে। মোট ছ'টি প্রজাতির নাম আছে সেখানে (১) গ্রীনব্রেস্টেড পিটা, (২) ইন্ডিয়ান রাডি কিং ফিশার, (৩) হোয়াইট ব্রেস্টেড ওয়াটার হেন্, (৪) লার্জ চেষ্টনাট বিটার্ন, (৫) প্যাডি বার্ড আর পন্ডহিরণ এবং (৬) ব্লাক বিটার্ন। পক্ষী বিশারদদের মতো এরা কেউই বিদেশি পাখি নয়, সবই দেশীয় মাছরাঙা, ডাহুক, বক, ঘুঘু, ফিঙে, হরিয়াল জাতীয় পাখি। অতএব দেশ - বিদেশের পাখি আসে বলে যে রটনাটি আছে তা সর্বাংশে সত্য নয়। সত্য নয় আত্মহননের রটনাও। সম্প্রতি কোনও কোনও গবেষক বলেছেন জাতিঙ্গা অঞ্চলের মাটিতে নাকি এমন চুম্বকত্ব থাকা সম্ভব যে কুয়াশা ও বৃষ্টির সময় যেখানে শ্যামাপোকার মতো পাখি উড়ে আসে। জাতিঙ্গার নাকি বড় রকমের জিওলজিক্যাল ফল্ট আছে। কিন্তু গবেষকেরা পত্র পত্রিকায় জনপ্রিয় প্রবন্ধ লিখলেও বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন না। 'শ্যামাপোকার মতো' পাখি আসে এ তথ্য তাঁরা কোথায় পেলেন? জাতিঙ্গা উপত্যাকার যে ভৌগোলিক গঠন ও অবস্থান লক্ষ করেছি তাতে মনে হয়, অন্ধকার ঝটিকা বিক্ষুব্ধ শীতের রাতে যেখানে বাতাসের গতিবেগ থাকবে মধ্যম থেকে তীব্র সেখানে বিধবস্ত ও দিগভ্রান্ত পাখিদের আলোর নিশানা অনুসরণ করে ছুটে আসা অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপার নয়। এর মধ্যে যাঁরা আত্মহত্যার প্রবণতা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের চিন্তাশক্তি সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে প্রাণীজগতে আত্মরক্ষার প্রবণতাই চরম সত্য। গণেশ দে-র টিনের চালে যে দেড়শো গ্রাম ওজনের পাখিটা ছুটে এসে মরেছিল সে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার, মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার ছিল না।

ফিরে আসার সময় একজন বলল, 'আজকাল পাখি তেমন আসে না, ওরা অনেক কমে গেছে।' কমে তা যাবেই, পাখিমারা বন্দুক আর গুলতি নিয়ে আদিবাসী ছেলেদের হামেশাই দেখা যায় বনের রাস্তায়। দেখলাম গোটা হরিণ মেরে নিয়ে যাচ্ছে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে। বাধা দেবার কেউ নেই, তা পাখির নিরাপত্তা দেবে কে? আন্তর্জাতিক চুক্তি করেও তো এদেশে পক্ষীনিধন বন্ধ করা যায় নি। বিহারের বেগুসরাই জেলার কাবার লেকে সোভিয়েত দেশ থেকে অনেক পাখি আসে। হিসেব করে দেখা গেছে প্রতি বছর শীত মরসুমে প্রায় সত্তর হাজার পাখি এখানে ধৃত হয়। সাহানি ধীবর সম্প্রদায়ের লোকের অন্ধকার রাতে ফাঁদ পেতে এই পাখিদের ধরে, খায় এবং বিক্রি করে। প্রায় চারশো প্রজাতির পাখি হত্যা নিষিদ্ধ করে ভারত - সোভিয়েতের মধ্যে একটা চুক্তিও হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পক্ষীনিধন চলছেই। তবে জাতিঙ্গার মতো বিহারে বা দেশের অন্যত্র রহস্যময় গালগল্প বানানো যায়নি। গেলে আর কিছু না হোক, লক্ষ লক্ষ সরকারি টাকা গবেষণার খাতে খরচ করা যেত।